১৯৭১ ভেতরে বাইরে, অধ্যায়ঃ বীরত্বসূচক খেতাব

একটি নিরপেক্ষ এবং নির্মোহ বিশ্লেষন (শেষ পর্ব)

পটভূমিঃ '১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয়ী হলো। ফলে আওয়ামী লীগ মেজরিটি পেলো। যার ফলশ্রুতিতে সাংবিধানিকভাবে বঙ্গবন্ধুই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও জানুয়ারী মাসে বঙ্গবন্ধু'কে পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আখ্যায়িত করেন' (মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি র্নিদলীয় ইতিহাস, গোলাম মুরশিদ)। সেই সময় ঢাকা রেডিও এবং টি ভি'তেও বঙ্গবন্ধুর নামের আগে 'দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী' বিশেষন ব্যাবহার করা হতো। যদিও ভিতরে ভিতরে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ছুতো খুজতে থাকেন এই নির্বাচনের রায় বানচাল করার জন্য। ১লা র্মাচ পাকিস্তানী শাসকরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী ঘোষনা করলে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২৫শে র্মাচ রাত্রে বব্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে অকল্পনীয় হত্যাকান্ড চালায় তার ফলেই প্রায় কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আকস্মিকভাবে শুরু হয়।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ঃ ১৯৭১ সালের র্মাচ এবং এপ্রিলে প্রাথমিক সামরিক প্রতিরোধে অংশগ্রহনকারীদের শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগই ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী, ই পি আর, পুলিশ, আনসার থেকে আগত সদস্য। প্রথমিক পর্যায়ের এই প্রতিরোধ এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। একই সময়ে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-জনতা প্রতিদিন সীমান্ত অতিক্রম করতে থাকেন ভারতে প্রশিক্ষন গ্রহনের জন্য। এপ্রিলের শেষ নাগাদ প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহন কারীদের প্রায় সবাই ভারতে আশ্রয় গ্রহন করতে বাধ্য হন। টাঙ্গাইলের মধুপুরের গড় এবং রৌমারী থানা র্দূগম এলাকা হওয়ার কারনেই সীমান্ত অতিক্রম না করে এই এলাকায় প্রতিরোধ বাহিনীর বেশ কিছু সদস্য আশ্রয় গ্রহন করেন।

প্রতিরোধ থেকে মুক্তিযুদ্ধঃ মে মাসের দিকে মাসে ৫ হাজার গেরিলা প্রশিক্ষন পাচ্ছিল, যা অক্টোবরে মাসে ২০ হাজারে উন্নীত হয়। প্রতিদিনই মুক্তিযুদ্ধে বেসামরিক সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা একই থাকার ফলে মুক্তিবাহিনী'তে বেসামরিক যোদ্ধাদের অনুপাত প্রতি দিনই উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকে। বেসামরিক ছাত্র-জনতা'র মধ্য থেকে ভারতের মুর্তি নামক স্থানে সামরিক বাহিনীর অফিসার হিসাবেও ট্রেনিং শুরু হয়, এবং প্রথম ব্যাচ কমিশন লাভ করে মুক্তিযূদ্ধ চলাকালীন সময়েই। শহীদ লেফটেন্যান্ট আশফাকুস সামাদ বীর উত্তম, শেখ কামাল, মেজর কাইয়ুম খান (অব) এই ব্যাচেই কমিশন লাভ করেন। মাঠ-পর্যায়ে যুদ্ধের নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই সামরিক অফিসারদের হাতে থেকেই যায়।

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্তর্বতী এলাকায় প্রতক্ষ্যভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পরে, এবং ৩ রা ডিসেম্বর ভারত র্কতৃক বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতি প্রদানের সাথে সাথেই ভারতীয় সামরিক বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে সরাসরি পাকিস্তানের সাথে র্পূনাংগ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২১ নভেম্বরের পূর্ব্ব পর্যন্ত রৌমারী এবং বিলুনিয়া ব্যাতীত কোন ভূখন্ডই মুক্তিবাহিনীর সর্ম্পূন নিয়ন্ত্রনে ছিল না। এর কারনও ছিল, কারন মুক্তিবাহিনী'র কাছে সেই সময় কোন ট্যাংক, যুদ্ধ বিমান তো দুরের কথা, ট্যাংক, যুদ্ধ বিমান বিধ্বংসী কোন অস্ত্রই ছিল না।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে 'বিজয় দিবসে' আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহনকারীদের কমপক্ষে ৮০ শতাংশ ছিলেন বেসামরিক ব্যাক্তিত্ব (৯০,০০ এর মত, মূলত ছাত্র এবং কৃষক, শ্রমিক) এবং বাকী অংশ ছিল সামরিক ব্যাক্তিত্ব (পাকিস্তান সেনাবাহিনী, ই পি আর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ থেকে আগত প্রায় ২০ হাজার সদস্য)। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় ৯০ ভাগই ছিলেন এই অসামরিক ব্যাক্তিত্ব। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী'র বেশ কয়েকজন র্ঊধতন র্কমর্কতা ও প্রাক্তন সেক্টর কমান্ডার'দের মতে এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মূল কারন, এই সব বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন প্রচন্ড সাহসী কিন্তু আবেগ র্নিভর, বয়সে তরুন, পর্যাপ্ত সামরিক প্রশিক্ষন এবং সামরিক অভিজ্ঞতার অভাব।

এই সব সাহসী শহীদদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, শহীদ খাজা নিজামউদ্দিন ভূইয়া, বীর উত্তমঃ এই প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা ১৯৭১ সনের জানুয়ারিতে তিনি ততকালীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'কন্ট্রোলার অফ একাউন্টস' হিসাবে যোগদান করেন (১,পৃঃ ৪৯)। একাত্তুরের ২৫ শে মার্চের পর তিনি তার অত্যন্ত লোভনীয় চাকুরি ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ৪ই সেপ্টেম্বর রাতে তিনি পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে চরম সাহসিকতা প্রর্দশন করে নিহত হন। ১৯৭৩ সালে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শহীদ খাজা নাজিম উদ্দিন ভূইয়া'কে তার সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগের জন্য 'বীর উত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মেজর কামরুল ইসলাম ভূইয়া তার বইয়ে (১, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬) লিখেছেন এই ভাবে, " শহীদ নিজামকে বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত করে কতৃপক্ষ তাকে সম্মানিত করতে পারেন নাই। বরং তারা তাদের হীনমন্যতাই প্রকাশ করেছেন। শুধু নিজামের বেলায়ই নয় 'গ্যালান্ট্রি এওয়ার্ডে'র তালিকাটি দেখলে যে কোন বিবেকবান ব্যাক্তির চোখেই একটি বৈষম্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে যে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা শহীদের মধ্য থেকে একজনকেও সর্বোচ্চ উপাধি 'বীর শ্রেষ্ঠ' প্রদান করা হয়নি।

এই প্রসংগে, মেজর কামরুল ইসলাম ভূইয়া তার বইয়ে (১, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬) আরো লিখেছেন, "মুক্তিযুদ্ধে গ্যালান্ট্রি এওর্য়াড বিতরনে স্বজনপ্রীতির এই নমুনা সমগ্র জাতির জন্য চরম লজ্জাকর হলেও এই সত্যটি উল্লেখ না করে পারলাম না"। এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকালীন ৪ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল সি আর দত্তের বক্তব্যঃ (১, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬) "সাহসিকতার্পূন অবদান ও বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে বীর শ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করার জন্য ৪ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক হিসাবে সরকারের কাছে আমি সুপারিশ করেছিলাম"।

এই প্রসঙ্গেও বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী'র বেশ কয়েকজন ঊর্ধতন র্কমর্কতা ও প্রাক্তন সেক্টর কমান্ডার'দের অভিমত হল, এটা ইচ্ছাকৃত নয় এবং খুবই র্দূভাগ্যজনক। তাদের ব্যাখ্যা হলো যেহেতু, এই সব বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধারা বিচ্ছিন্ন ভাবে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এবং তারা কোন সেনা ইউনিটের সরাসরি সদস্য ছিলেন না, তাই তাদের বীরত্ব লিপিবদ্ধ করা তো দুরের কথা, তাদের নাম-ঠিকানাও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সংরক্ষন করা হয় নাই। তাই তাদের বীরত্ব আর ত্যাগের স্বীকৃতি'র কথা কখনোই জনসমক্ষে যথাযথ ভাবে প্রকাশ পায় নাই।

মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রকাশিত যুদ্ধভিত্তিক প্রায় সব জনপ্রিয় বই' এর লেখকই প্রাক্তন সামরিক ব্যাক্তিত্ব। তারাও তাদের বইয়ে এই সব বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের নাম-ঠিকানা লিপিবদ্ধ করতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন। এই সব অজানা বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব নিয়ে লেখা দুইটি বইয়ের ('একাত্তুরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা', মেজর হামিদুল হোসেন তারেক, বীর বিক্রম, 'জনযুদ্ধের গনযোদ্ধা', মেজর কামরুল ইসলাম ভুইয়া) লেখক'ও প্রাক্তন সামরিক ব্যাক্তিত্ব। শুধুমাত্র এই দুইটি বই পড়লেই বুঝা যায়, এই রকম কত বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রকাশিত সব বইয়ের মধ্যে মেজর নাসির রচিত "যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা" একটি অসাধারন রচনা। অসাধারন এই কারনে, এই বইয়ে তিনি নিরপেক্ষ ভাবে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি মানবিক দিক গুলিও ফুটিয়ে তুলেছেন। এক পর্যায়ে তিনি লিখেছেন এক বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধার আকুতির কথা (সেই মুক্তিযোদ্ধার দুই সহযোদ্ধা মারাত্মকভাবে আহত) যাতে তার বন্ধুদের জীবন বাঁচানো যায়। সেই দুই আহত মুক্তিযোদ্ধা কিছুক্ষন পরই মারা যান। আমাদের র্দূভাগ্য, মেজর নাসির এর মত মানবিক গুনসম্পন্ন অফিসারও কিন্তু সেই তিনজনের নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করেন নাই বা করলেও হয়তো ভূলে গিয়েছিলেন।

বীরত্বসুচক খেতাব হচ্ছে এমনই এক খেতাব যা শুধুমাত্র যুদ্ধে সাহসিকতা আর বীরত্বের জন্য দেওয়া হয়। যুদ্ধ পরিকল্পনা, খাদ্য বা অস্ত্র সংগ্রহের বা অন্য কোন রকম অবদানের জন্য দেওয়া হয় না। তাই মুক্তিবাহিনী প্রধান জেনারেল ওসমানী বা ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ম্যানেকশ কোন বীরত্বসুচক খেতাব পান নাই। ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ম্যানেকশ'কে যুদ্ধের পর 'ফিল্ড র্মাশাল' খেতাব দেওয়া হয়েছিল।

আমরা যদি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাহসীকতার জন্য প্রদত্ত পদক তালিকা দেখি তা হলে আমরা এইসব বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধে সাহসিকতার কোন প্রতিফলন দেখতে পাই না। সাতজন বীর শ্রেষ্ঠ'র মধ্যে একজনও বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাও নাই! অনেক বীর উত্তমের মধ্যে মাত্র কয়েকজন আছেন বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা। সব সেক্টর কমান্ডার'কে ঢালাও ভাবে (কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম এর ভাষায় 'খয়রাতি') বীর উত্তম খেতাব দেওয়া হয়েছিল। শহীদ এবং সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের বঞ্চিত করে' এই সব উচ্চাভিলাসী সেক্টর কনান্ডার'রা/সামরিক অফিসাররা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বটোয়ারা করে নিয়েছিলেন সব বীরত্ব সূচক পদক।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে অবিশাস্য, হাস্যকর, এবং উদ্ভট যুক্তি দিয়েছেন জনাব এ, কে খন্দকার! তিনি তার বইয়ের ২০৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, "মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক খেতাব প্রদানের সিদ্ধান্তে সব সেক্টর অধিনায়ক একমত ছিলেন না। কয়েকজন সেক্টর অধিনায়ক মনে করতেন, খেতাবের বিষয়টি পেশাদার সৈনিকদের জন্য প্রযোজ্য। দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খেতাব অবমাননাকর বা অপ্রয়োজনীয়। এতে করে মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেমকে খাটো করে দেখা হয়"!

এই যুক্তি দেখিয়েই বসে থাকেন নাই জনাব এ, কে খন্দকার! তিনিও সর্ম্পূন অনায্য ভাবে করায়ত্ত করেছেন সাহসিকতার জন্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক 'বীর উত্তম"। আমি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তন্ন-তন্ন করে ঘেঁটে দেখেছি, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তার সাহসিকতার কোন প্রমান তো **দুরের কথা, সরাসরি অংশগ্রহনেরও কোন প্রমান পাই নাই। সন্দিহান পাঠকের জন্য একাত্তুরের বীরযোদ্ধা,খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা দ্বিতীয় খন্ড থেকে জনাব এ, কে খন্দকারের উপর প্রকাশিত পৃষ্ঠা'টি সর্ম্পূন তুলে দিলাম।**

আবদুল করিম খন্দকার, বীর উত্তম

গ্রাম নতুন ভারেঙ্গা, উপজেলা বেড়া, পাবনা।
বাবা খন্দকার আবদুল লতিফ, মা আরেফা খাতুন।
স্ত্রী ফরিদা খন্দকার। তাঁদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৫৮।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আবদুল করিম খন্দকার (এ কে খন্দকার) জুন মাস থেকে মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা বহুমাত্রিক। বিশেষত মুক্তিবাহিনীর বিমানবাহিনী গঠনে তাঁর ভূমিকা ... জন্য। ষোলোই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ... মুক্তিবাহিনীর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর নিজ বয়ান থেকে কিছু কথা জানা যাক:

'২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর আমি নিজেকে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সদস্য হিসেবে ... নিতে পারছিলাম না। আমি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মাহরুবের সঙ্গে যোগাযোগ করে ৩ ... স্বাধীনতাযুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যোগাযোগব্যবস্থার জন্য যেতে পারিনি। ... মে আগরতলায় পৌঁছি। ১৬ মে সকালে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হই। কর্নেল ওসমানীর (আতাউল গনি ওসমানী, পরে জেনারেল) সঙ্গে দেখা হয়।

'১৯ বা ২০ মে আমরা কয়েকজন দিল্লি যাই ভারতীয় বিমানবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। উদ্দেশ্য ছিল বিমান সংগ্রহ করে বিমানবাহিনী গঠন করা। ভারতীয় বিমানবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়। আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম। বুঝতে পারলাম, রাজনৈতিক ও নানাবিধ কারণে তাঁরা আমাদের বিমান দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন না। সময় এলে তাঁরা আমাদের সাহায্য করবেন।

'তারপর আমরা কলকাতায় এলাম। সিদ্ধান্ত হলো, আমরা স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। এ সময় আমাকে মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুক্তিবাহিনীর জন্য রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো, এসব দায়িত্ব আমার ছিল। অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করার দায়িত্বও আমার ছিল।

'অস্ত্রশস্ত্র ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজন অনুসারে দেওয়া হতো। ... মাসে ২-৩ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের ভেতরে পাঠানো হয়। ... পর্যন্ত ১ লাখ ১ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল।

'গেরিলা বাহিনীতে স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং যুবকেরা বেশির ভাগ যোগ দিয়েছিল। ট্রেনিং শেষ করার পর প্রত্যেক সেক্টরে কতজন গেরিলা পাঠানো হবে, তা এবং অস্ত্রশস্ত্রের ... হেডকোয়ার্টার্স থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল।

'গেরিলাযুদ্ধের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের ভেতরে গ্রাম এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চলাচল মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে।...মুক্তিবাহিনীর এ সাফল্যই বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরাজয়ের মূল কারণ।

'প্রথম দিকে বিমানবাহিনীর সমস্ত পাইলট, টেকনিশিয়ান স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ... ঠিক হয় একটা এয়ার ইউনিট গঠন করা হবে। ভারতীয় বিমানবাহিনী আমাদের একটা ..., একটা অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার এবং একটা ডিসি-৩ ডাকোটা বিমান দিয়েছিল।'

সূত্রঃ একাত্তুরের বীরযোদ্ধা,খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা দ্বিতীয় খন্ড; প্রথমা প্রকাশন

সময়ের সাথে সাথে প্রতক্ষ্যর্দশীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আর তাই, র্বতমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকাংশ মানুষের কাছে এই বীরত্বসূচক খেতাবের তালিকাই হচ্ছে এবং হবে মুক্তিযুদ্ধের 'ট্রাম্পক্রিপট'। এই তালিকা দেখেই তাদের ভ্রান্ত ধারনা হবে, কারা দেশের জন্য অত্মত্যাগ করেছিল, সাহসিকতা দেখিয়েছিল রনাঙ্গনে। এর সপক্ষে সবচেয়ে বড় উদাহরন হচ্ছে, সাত জন বীর শ্রেষ্ঠ'র সবাই সামরিক বাহিনীর সদস্য। এই পক্ষপাতদুষ্ট এবং অসর্ম্পূন বীরত্বসূচক খেতাব তালিকা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। তাই তো আজ অনেকে, দাবী করেন এবং বিশেষত নতুন প্রজন্ম মনে করেন যে ১৯৭১ সালে সামরিক বাহিনীর অফিসার আর সদস্যরাই শুধু যুদ্ধ করেছিল।

'মুক্তিযুদ্ধঃ উপেক্ষিত গেরিলা' গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক আবু সাইয়িদ তাই যর্তাথই লিখেছেন, "হাজারো গেরিলার আত্মবলিদানের মহিমায় বিশেষ দিবস উদ্ভাসিত, সেনাকুঞ্জে আলোকজ্জল পাদপীঠ, উষ্ণ সর্ম্বধনায় বঙ্গভবন কোলাহল মূখরিত এবং অজানা গেরিলার গৌরবগাঁথা লজ্জাহীনভাবে কণ্ঠে ঝুলিয়ে আছেন ইতিহাস তাদের প্রশ্নবিদ্ধ করবে"।

মুক্তিযোদ্ধা জনাব এ, কে খন্দকার আজও অজানা গেরিলার গৌরবগাঁথা লজ্জাহীনভাবে কণ্ঠে ঝুলিয়ে আছেন, সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহন না করেও করায়ত্ত করেছেন 'বীর উত্তম'। স্বাধীনতার সুফল ভোগ করেছেন সব আমলেই, আর র্নিলজ্জের মত বলে চলেছেন নীতি'র কথা! আমার সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন এবং র্বতমান বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমিও জনাব এ, কে খন্দকার'এর বইয়ের ভাষায়ই (পৃঃ ১১) বলতে চাই "সত্যের স্বার্থে এই লেখার প্রয়োজন ছিল। কাউকে খাটো করা বা কারও উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া বা কারও ছিদ্র অনুসন্ধান করার জন্য নয়, নেহাতই সত্য প্রকাশের জন্য এটি করেছি।

তথ্যসূত্রঃ

১। স্বাধীনতা পঞ্চম খন্ড, মেজর কামরুল ইসলাম ভূইয়া সম্পাদিত
২। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগষ্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল
৩। ‘বিটার সুইট ভিক্টরী, আ ফ্রিডম ফাইটারস টেইল’ মেজর কাইয়ুম খান (অব)
৪। একাত্তর আমার; মোহম্মদ নুরুল কাদের
৫। বিদ্রোহী র্মাচ ১৯৭১, মেজর রফিকুল ইসলাম (অব) পি এস সি
৬। মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি র্নিদলীয় ইতিহাস, গোলাম মুরশিদ
৭।একাত্তুরের গেরিলা, জহিরুল ইসলাম
৮। গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে, মাহবুব আলম
৯। একাত্তুরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা’, মেজর হামিদুল হোসেন তারেক, বীর বিক্রম
১০। চাঁদপুরে নৌ-মুক্তিযুদ্ধ, মো শাহজাহান কবির বীরপ্রতীক
১১। BRAVE OF HEART, Habibul Alam, Bir Pratik
১২। যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা, মেজর নাসির
১৩। স্বাধীনতা ৭১, কাদের সিদ্দিকী
১৪। একাত্তুরের দিনগুলি, জাহানারা ইমাম
১৫। একাত্তুরের বীরযোদ্ধা,খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা দ্বিতীয় খন্ড; প্রথমা প্রকাশন
১৬। মুক্তিযুদ্ধঃ উপেক্ষিত গেরিলা, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ
১৭। বসন্ত ১৯৭১, ফারুক আজিজ খান

নাজমুল আহসান শেখ, ১০ জুন ২০১৫ সিডনী, victory1971@gmail.com